

সূরা আত তাওবাঃ রুকুঃ ১০ম আয়াত সংখ্যাঃ (৭৩-৮০)

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ ٩٣ : ٩٤

(৭৩) হে নবী! তুমি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা।

এ পর্যন্ত মুনাফিকদের কার্যকলাপের ব্যাপারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করা হচ্ছিল। এর দুটি কারণ ছিল।

এক, তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের হাত এত বেশী শক্তিশালী হতে পারেনি, যে, বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাথে সাথে তারা ভেতরের শত্রুদের সাথেও লড়াই করতে পারতো।

দুই, যারা সন্দেহ-সংশয়ে ডুবে ছিল ঈমান ও প্রত্যয় লাভ করার জন্য তাদেরকে যথেষ্ট সুযোগ দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য।

এ দু' টি কারণ এখন আর বর্তমান ছিল না। মুসলিম শক্তি এখন সমগ্র আরব ভূখণ্ডকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিয়েছিল এবং আরবের বাইরের শক্তিগুলোর সাথে সংঘাতের সিলসিলা শুরু হতে যাচ্ছিল। এ কারণে ঘরের এ শত্রুদের মাথা গুড়ো করে দেয়া এখন সম্ভবও ছিল এবং অপরিহার্যও হয়ে পড়েছিল। তাহলে তারা আর বিদেশী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে দেশে আভ্যন্তরীণ বিপদ সৃষ্টি করতে পারতো না। তাছাড়া তাদেরকে বছর সময় দেয়া হয়েছিল চিন্তা-ভাবনা করার, বুঝার এবং আল্লাহর সত্য দ্বীনকে যাচাই-পর্যালোচনা করার জন্য। তাদের মধ্যে যথার্থ কল্যাণ লাভের কোন আকাঙ্ক্ষা থাকলে তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারতো। এরপর তাদেরকে আরো বেশী সুযোগ সুবিধা দেয়ার মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও এবার জিহাদ শুরু করে দিতে হবে এবং এদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত যে উদার নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তার অবসান ঘটিয়ে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে।

তাই বলে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ও কঠোর নীতি অবলম্বন করার মানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নয়। আসলে এর অর্থ হচ্ছে, তাদের মুনাফিকী মনোভাব ও কর্মনীতিকে এ পর্যন্ত যেভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং যে কারণে তারা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থেকেছে, সাধারণ মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের সমাজেরই একটি অংশ মনে করেছে এবং তারা ইসলামী দল ও সংগঠনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ও ইসলামী সমাজে মুনাফিকীর বিষ ছড়াবার যে সুযোগ পেয়েছে তা এখন ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে। এখন যে ব্যক্তিই মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করবে এবং যার কার্যধারা থেকে একথাও প্রকাশ হবে, যে সে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু' মিনদের অন্তরঙ্গ বন্ধু নয়, সর্ব সম্মুখে তার মুখোশ

খুলে দিতে হবে এবং নিন্দা করতে হবে। মুসলিম সমাজে তার মর্যাদা ও আস্থা লাভের সকল প্রকার সুযোগ খতম করে দিতে হবে। তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। দলীয় পরামর্শের ক্ষেত্রে থেকে তাকে দূরে রাখতে হবে। আদালতে তার সাক্ষ্য অনির্ভরযোগ্য গণ্য করতে হবে। বড় বড় পদ ও মর্যাদার দরজা তার জন্য বন্ধ করে দিতে হবে। সভা-সমিতিতে তাকে গুরুত্ব দেবে না।

প্রত্যেক মুসলমান তার সাথে এমন আচরণ করবে যাতে সে নিজে অনুভব করতে পারে যে, সমগ্র মুসলিম সমাজে কোথাও তার কোন মর্যাদা ও গুরুত্ব নেই এবং কারো অন্তরে তার জন্য এতটুকু সম্মমবোধও নেই। তারপর তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি কোন সুস্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তার অপরাধ লুকানো যাবে না এবং তাকে ক্ষমা করা ও যাবে না। বরং সর্ব সমুখে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দামা চালাতে হবে এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। এ পর্যায়ে মুসলমানদেরকে এ নির্দেশটি দেয়ার প্রয়োজন ছিল। এছাড়া ইসলামী সমাজকে অবনতি ও পতনের আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ থেকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো না। যে জামায়াত তার নিজের মধ্যে মুনাফিক ও বিশ্বাসঘাতকদেরকে লালন করে এবং যেখানে দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা হয়, তার নৈতিক অধঃপতন এবং সবশেষে পূর্ণ ধ্বংস ছাড়া গত্যন্তর নেই। মুনাফিকী প্লেগের মতো একটি মহামারী। আর মুনাফিক হচ্ছে এমন একটি ইঁদুর যে এ মহামারীর জীবাণু বহন করে বেড়ায়। তাকে জনবসতির মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দেয়ার অর্থ গোটা জনবসতিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া।

মুসলমানদের সমাজে একজন মুনাফিকদের মর্যাদা ও সম্মম লাভ করার অর্থ হলো হাজার হাজার মানুষকে বিশ্বাসঘাতকতা ও মুনাফিকী করতে দুঃসাহস যোগানো। এতে সাধারণে এ ধারণা বিস্তার লাভ করে যে, এ সমাজে মর্যাদা লাভ করার জন্য আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও সাদ্কা ঈমানদারীর কোন প্রয়োজন নেই। বরং মিথ্যা ঈমানদের প্রদর্শনীয় সাথে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার পথ অবলম্বন করেও এখানে মানুষ ফুলে ফেঁপে বড় হয়ে উঠতে পারে। একথাটিই রসূলুল্লাহ ﷺ তার একটি সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام

“যে ব্যক্তি কোন বিদআত পন্থীকে সম্মান করলো সে আসলে ইসলামের ইমারত ভেঙ্গে ফেলতে সাহায্য করলো।”

নবী (সাঃ)-এর গত হওয়ার পর তাঁর উম্মাত হল এ সম্বোধনের লক্ষ্য। কাফেরদের সাথে সাথে মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করার যে আদেশ করা হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

এক রায় হল এই যে, যদি মুনাফিকদের মুনাফিকী এবং তাদের চক্রান্ত স্পষ্টাকারে প্রকাশ পায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হবে; যেমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় রায় হল যে, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হল এই যে, তাদেরকে জিহ্বা দ্বারা ওয়ায-নসীহত করা হবে অথবা তারা চারিত্রিক কোন সীমালংঘন করলে তাদের উপর হদ্ (দন্ডবিধি) জারী করা হবে।

এ আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের বৈঠক সমাবেশে কুফরী কথাবার্তা বলতে থাকে এবং তা যখন মুসলিমরা জেনে ফেলে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেদের সুচিত্রা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। ইমাম বগভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গযওয়ায়ে তাবুক প্রসঙ্গে এক ভাষণ দান করেন যাতে মুনাফিকদের অশুভ পরিণতি ও দূরবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক মুনাফিকও ছিল। সে নিজ বৈঠকে গিয়ে বলল, মহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেন তা যদি

সত্যি হয়, তবে আমরা (মুনাফিকরা) গাধার চাইতেও নিকৃষ্ট। তার এ বাক্যটি আমার ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু নামক এক সাহাবী শুনে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেন নিঃসন্দেহে তা সত্য এবং তোমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুকের সফর থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন, তখন আমার ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন। জুল্লাস নিজের কথা ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে যে, আমার ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে (আমি এমন কথা বলিনি)। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়কে মিস্বরে-নববী'র পাশে দাঁড়িয়ে কসম খাবার নির্দেশ দেন। জুল্লাস অবলীলাক্রমে কসম খেয়ে নেয় যে, আমি এমন কথা বলিনি, আমার মিথ্যা কথা বলেছে। আমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পালা এলে তিনিও (নিজের বক্তব্য সম্পর্কে) কসম খান এবং পরে হাত উঠিয়ে দো'আ করেন যে, হে আল্লাহ আপনি ওহীর মাধ্যমে স্বীয় রাসূলের উপর এ ঘটনার তাৎপর্য প্রকাশ করে দিন।

তাঁর প্রার্থনায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সমস্ত মুসলিম 'আমীন' বললেন। তারপর সেখান থেকে তাঁদের সরে আসার পূর্বেই জিবরীলে-আমীন ওহী নিয়ে হাযির হন যাতে উল্লেখিত আয়াতখানি নাযিল হয়। জুল্লাস আয়াতের পাঠ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখন স্বীকার করছি যে, এ ভুলটি আমার দ্বারা হয়ে গিয়েছিল। আমার ইবন কায়েস যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য। তবে এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাকে তাওবাহ করার অবকাশ দান করেছেন। কাজেই এখনই আমি আল্লাহর নিকট মাগফেরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সাথে সাথে তাওবাহ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার তাওবাহ কবুল করে নেন এবং তারপর তিনি নিজ তাওবায় অটল থাকেন। তাতে তার অবস্থাও শুধরে যায়। [বাগভী]

কোন কোন তফসীরবিদ মনীষী এ আয়াতের শানে-নুযূল প্রসঙ্গে এমনি ধরণের অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা করেছেন। যেমন, তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের বিখ্যাত ঘটনা যে, মুনাফিকদের বার জন লোক পাহাড়ী এক ঘাটিতে এমন উদ্দেশ্যে লুকিয়ে বসেছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এখানে এসে পৌছবেন, তখন আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলবে। এ ব্যাপারে জিবরীলে আমীন তাকে খবর দিলে তিনি এ পথ থেকে সরে যান এবং এতে করে তাদের হীনচক্রান্ত ধুলিস্মাৎ হয়ে যায়। [ইবন কাসীর] এছাড়া মুনাফিকদের দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য ঘটনাও সংঘটিত হয়। তবে এসবের মধ্যে কোন বৈপরীত্য কিংবা বিরোধ নেই। এ সমুদয় ঘটনাই উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে।

--- অনুরূপ কথাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট তারপর আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন। আর তোমরা ছিলে দরিদ্র, আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদেরকে ধনী করেছেন। তারা যখনই রাসূলের মুখ থেকে কোন কথা শুনছিল তখনই বলছিল, আল্লাহ ও তার রাসূলের দয়াই বেশী। [বুখারী ৪৩৩০; মুসলিম: ১০৬১]

--মুসলিমদের হিজরতের পর মদীনা শহর কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। যার কারণে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যও বড় উন্নতি লাভ করতে লাগল এবং তার ফলে মদীনাবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা হয়ে উঠল। মদীনার মুনাফিকরাও এতে উপকৃত হল। আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে এ কথাই বলেছেন, তারা কি এই দোষ

আরোপ করে অথবা এই কথায় নারাজ যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে ধনী বানিয়ে দিয়েছেন? অর্থাৎ এটা নারাজ হওয়ার, রাগ বা দোষের কথা তো নয়। বরং তাদেরকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তিনি তাদেরকে দরিদ্রতা থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছল ও ধনবান বানিয়ে দিয়েছেন। জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ তাআলার সাথে রসূল (সাঃ)-এর উল্লেখ এই জন্য করা হয়েছে যে, এই সচ্ছল ও ধনবান হওয়ার বাহ্যিক কারণ হলেন নবী (সাঃ)। আসলে আল্লাহই হলেন সচ্ছলতা ও ধনদাতা। এই জন্যই আয়াতে **فَضْلِهِ** (ফাযল্হি) একবচনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিয়েছেন।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ ٩٥

(৭৫) তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল, আল্লাহ যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহ হতে দান করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা দান-খয়রাত করব এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

অঙ্গীকার: এই আয়াতে মুনাফিক বা কপট স্বভাবের কিছু মানুষের মানসিকতা তুলে ধরা হয়েছে। তারা আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতি দিত যে আল্লাহ যদি তাদের অর্থসম্পদ ও সচ্ছলতা দেন, তবে তারা দান-সদকা করবে এবং ভালো মানুষ হয়ে চলবে।

"আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাঁদেরকে দিয়েছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর; বরং এটা তাদের জন্য চরম অকল্যাণকর। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করেছে, কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে।" সূরা আল-ইমরান (৩:১৮০)

এবং তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) কৈফিয়ত চাওয়া হবে।" সূরা আল-ইসরা (১৭:৩৪):

পরবর্তী পরিণতি: এর ঠিক পরের আয়াতে (৭৬ নম্বর আয়াতে) আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, যখন তিনি তাদেরকে সচ্ছলতা ও সম্পদ দিলেন, তখন তারা কৃপণতা করল এবং তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করে মুখ ফিরিয়ে নিল।

ওয়াদা ভঙ্গ করা যে মুনাফিকির প্রধান লক্ষণ, তা রাসুলুল্লাহ (সা.) বহু হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন: • মুনাফিকের লক্ষণ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি: যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তা খেয়ানত করে।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, যখন কোনো চুক্তি বা ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল গালিগালাজ করে।" (সহীহ বুখারী)

لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ٩٨ : ٩

(৭৮) তারা কি জানত না যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ অবগত আছেন? এবং নিশ্চয় আল্লাহ অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী?

এতে সেই সমস্ত মুনাফিকদের প্রতি তিরস্কার ও ধমক রয়েছে যারা আল্লাহ তাআলার সাথে অঙ্গীকার করে থাকে, অতঃপর তার পরোয়া করে না। যেন তারা ভাবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের গোপন কথা এবং অন্তরের রহস্য জানেন না। অথচ আল্লাহ তাআলা সব কিছুর ব্যাপারে অবগত, তিনি অদৃশ্যজ্ঞাতা, তিনি গায়েবের সমস্ত খবর জানেন।

"তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তিরও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না; তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক এবং যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। সূরা আল-মুজাদালাহ্, আয়াত ৭

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমরা জানি। আর আমরা তার গ্ৰীবাস্তিত ধমনীর চেয়েও নিকটতর। সূরা ক্বাফঃ১৬

মানুষ যা কিছু গোপন করে এবং অন্তরে লুকিয়ে রাখে, তা সব কিছুই আমি জানি। ‘অসঅসাহ’ (কুমন্ত্রণা) অন্তরে উদীয়মান সেই কল্পনাগুলোকে বলা হয়, যার জ্ঞান ঐ মানুষটি ছাড়া আর কারো থাকে না। কিন্তু আল্লাহ সেই কল্পনাগুলোও জানেন। এই জন্য হাদীসে এসেছে যে, “মহান আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তরে উদীয়মান কুখ্যলগুলোকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, সেগুলোর উপর কোন ধরপাকড় হবে না, যতক্ষণ না সেগুলো মুখে প্রকাশ অথবা কাজে পরিণত করবে। (বুখারীঃ কিতাবুল ঈমান, মুসলিম)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ۖ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۖ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ۖ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ : ٩

৭৯. মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ছাড়া কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে। অতঃপর তারা তাদের নিয়ে উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে নিয়ে উপহাস করেন; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

مُطَّوِّعِينَ শব্দের অর্থ হল ওয়াজেব সাদকাহ (যাকাত) ছাড়াও নিজ খুশী মতে আল্লাহর রাহে অতিরিক্ত ব্যয়কারী। جُهْدُ শব্দের অর্থ হল শ্রম ও কষ্ট। অর্থাৎ, সেই সব মানুষ যারা ধনবান নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদের মেহনত ও কষ্টের সাথে উপার্জিত সামান্য মাল থেকেও অল্প কিছু দান করে থাকে। আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের আরো একটি নোংরা আচরণের কথা উল্লেখ হয়েছে। আর তা এই যে, যখন আল্লাহর রসূল (সাঃ) যুদ্ধ প্রভৃতির ব্যাপারে মুসলিমদেরকে দান করতে আহ্বান করতেন, তখন তাঁরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ক্ষমতানুযায়ী দান করতেন। কারো কাছে অধিক মাল থাকলে তিনি বেশী বেশী স্বাদক্বাহ করতেন। আর অল্প থাকলে অল্পই দিতেন। এই মুনাফিকরা উভয় প্রকার মুসলমানদের প্রতি ভৎসনা করত। আর অধিক দানকারীর জন্য বলত, এর উদ্দেশ্য হল লোক দেখানো। আর স্বল্প দানকারীকে বলত, তোমার এই সামান্য মাল স্বাদক্বাহ করায় কি উপকার হবে? অথবা আল্লাহ তাআলা তোমার এই স্বল্প মালের মুখাপেক্ষী নন। (বুখারী সূরা তাওবার ব্যাখ্যা পরিচ্ছেদ, মুসলিম যাকাত অধ্যায়) এইভাবে মুনাফিকরা মুসলিমদের সাথে ঠাট্টা-পরিহাস করত।

অর্থাৎ, মু' মিনদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার বদলা এইভাবে দিয়ে থাকেন যে, তাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন। এটি হল (কর্মের অনুরূপ দন্ডদান নীতি এবং) অলংকার শাস্ত্রের সাদৃশ্য সাধনের রীতি। অথবা এটা হল বদদুআস্বরূপ। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথেও উপহাস করুন, যেমন তারা মুসলিমদের সাথে করে থাকে।

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۗ ۝ ৮০ : ৯
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

৮০) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান); যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না; যেহেতু তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

তাফসীরবিদগণ বলেন, এ আয়াত তখন নাযিল হয়, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন মুনাফিকের জন্য ক্ষমার দো'আ করছিলেন। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

সত্তরের সংখ্যা আধিক্য বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তুমি যত বেশীই তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর না কেন, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, ৭০ বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করলে তারা ক্ষমালাভ করবে।

"তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" সূরা আল-মুনাফিকুন (৬৩:৬)

"নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোনো পথও দেখাবেন না।" সূরা আন-নিসা (৪:১৬৮)

এখানে ক্ষমা না করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে মানুষ কারো সুপারিশের আশায় বসে না থাকে; বরং ঈমান ও নেক আমলের পুঁজি সংগ্রহ করে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়। যদি এই আখেরাতের পাথেয় কারো কাছে না থাকে, তাহলে এমন কাফের ও অবাধ্যদের জন্য কেউ সুপারিশ করবে না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের জন্য সুপারিশের অনুমতিই দান করবেন না।

-- এই হিদায়াত (পথপ্রদর্শন) থেকে সেই হিদায়াত উদ্দেশ্য যা মানুষকে তার অভীষ্ট (ঈমান) পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। নতুবা হিদায়াত অর্থ হল, পথনির্দেশ করা। যার সুব্যবস্থা প্রত্যেক মু' মিন ও কাফেরের জন্য করে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ৭৬ : ৩

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

“আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ। (সূরা দাহর ৩ আয়াত) তিনি আরো বলেছেন, “এবং আমি কি তাকে দু’ টি পথ দেখাইনি?” (সূরা বালাদ ১০ আয়াত)

অন্যত্র বলা হয়েছে এভাবে, “শপথ (মানুষের) প্রবৃত্তির আর সে সত্তার যিনি তাকে (সব রকম বাহ্যিক) ও আভ্যন্তরীণ শক্তি দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। আর পাপাচার ও তাকওয়া-পরহেজগারীর অনুভূতি দু’ টোই তার ওপর ইলহাম করেছেন।” [সূরা আশ-শামস: ৭-৮]

মুশরিকদের জন্য রাসুল (সা.) বা মুমিনদের ক্ষমা প্রার্থনা করার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে বলা হয়েছে:

"নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে—যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়; তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা প্রজ্বলিত অগ্নির (জাহান্নামের) অধিবাসী।" সূরা আত-তাওবা (৯:১১৩)

সহীহ বুখারী (৪৬৭০) ও তিরমিজী (৩০৯৭) গ্রন্থে মুনাফিকদের প্রধান আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল-এর জানাজা ও ক্ষমা প্রার্থনার প্রেক্ষাপটে সূরা আত-তাওবার ৮০ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যাসংবলিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট ও হাদীসের সারসংক্ষেপ

• আবদুল্লাহ বিন উবাইর মৃত্যু: যখন মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই মারা যায়, তখন তার আন্তরিক মুমিন পুত্র রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে পিতার জানাজার নামাজ পড়ানোর এবং কাফনের জন্য তাঁর জামাকাপড় দেওয়ার অনুরোধ জানান।

• হজরত ওমরের আপত্তি: হজরত ওমর (রা.) রাসূল (সা.)-কে আবদুল্লাহ বিন উবাইর জানাজা পড়াতে উদ্যত হতে দেখে তাঁর কাপড় ধরে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এমন ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়বেন, যাকে আপনার রব নিষেধ করেছেন?"

• নবীজির উত্তর: রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন জবাবে বলেন, "আল্লাহ তাআলা আমাকে এখতিয়ার দিয়েছেন—তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর, সত্তর বার করলেও আল্লাহ ক্ষমা করবেন না (৯:৮০)—তাই আমি সত্তর বারেরও বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করব।"

• চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ: রাসূল (সা.) তার জানাজা পড়ার পর পরই আল্লাহ তাআলা চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করে সূরা আত-তাওবা (৯:৮৪) নম্বর আয়াত নাজিল করেন: "আর তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে কখনো তার জানাজার নামাজ পড়বেন না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়বেন না..."

আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মদীনার সমস্ত মুনাফিকদের নাম জানিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) এই গোপন তালিকাটি তাঁর বিশ্বস্ত সাহাবী হজরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)-কে প্রদান করেন। এই কারণে হুজাইফা (রা.)-কে "রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গোপন রহস্যের হেফাজতকারী" বলা হতো।

• পরবর্তী প্রভাব: রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর খলীফা হজরত ওমর (রা.) কোনো মৃত ব্যক্তির জানাজা পড়ার আগে দেখতেন সেখানে হুজাইফা (রা.) উপস্থিত আছেন কি না। হুজাইফা (রা.) জানাজায় না গেলে ওমর (রা.) বুজে নিতেন যে মৃত ব্যক্তিটি মুনাফিক ছিল এবং তিনিও তার জানাজা পড়তেন না।